মহামানবের দিব্য পরশে

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

সেদিন ছিল শিবরাত্রি। মহানিশায় শিবের পূজা সমাপনান্তে ক্রিয়ার পরাবস্থায় উপনীত হইয়া আসনে সাধনে বসিয়াছি। প্রথম থেকেই মস্তকের উপরিভাগের ব্যোম-মণ্ডলে চলিতেছিল মেঘের গর্জন ও শ্বেতশুভ্র বৈদ্যুতিক ঝিলিকের খেলা। এই খেলা বেশীক্ষণ হইল না। অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলে উদ্ভাসিত হইল সেই ভয়ঙ্কর বিদ্যুতের ঝলকের আলো — কড় কড় কড়াৎ! নিমেষে পতিত হইল সেই প্রবল বজ্রপাত — মস্তকের 'বামা' কেন্দ্রে — দেহটিকে ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া দিল — অসম্প্রজ্ঞাত-নির্বিকল্প-নির্বীজ সমাধিতে বোধ নিমগ্ন হইল। ইহার পর সোনালী শীতল অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির আহ্বানে সত্তার বোধ আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল। সম্বিৎ আসার মুহূর্তেই অনুভব করিলাম, আমার সম্মুখে একটি সূর্য্য-থালের মত কোটি সূর্য্যের জ্যোতি সম্পন্ন কোনও মহাসত্তার আলোক, যিনি আমায় আহ্বান করিয়া সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিয়াছেন। সেই মহাসত্তার সোনালী জ্যোতির সূর্য্য-থালের মধ্য দিয়া দেখিলাম যে আমার কক্ষের সব বস্তুগুলিই সূর্য্যরশ্মির চিন্ময় জ্যোতিতে আপ্লুত হইয়া সোনার বরণ প্রাপ্ত হইয়াছে। সূর্য্য-থালের মত জ্যোতির মহাসত্তার দিকে চাহিয়া মনে ভাবনার উদয় হইল — ইনি কে? তৎক্ষণাৎ সূর্য্যথালাসম স্বচ্ছ জ্যোতি একটু একটু করিয়া ধাপে ধাপে ছোট হইতে লাগিল এবং আমার সেই ঘরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের পাথরের ধবল-শুভ্র মূর্তির দিকে যাইতে লাগিল। তারপর লাহিড়ী মহাশয়ের মূর্তির নিকট যখন পৌঁছিল তখন বেশ ছোট্ট বিন্দুতে পরিণত হইয়া গিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের বক্ষস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল! আর আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া উঠিলাম। শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের মূর্তিটির দিকে তাকাইলাম; দেখিলাম, লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন্ত রূপ; আমার দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি হাসিতেছেন। অন্তরে প্রশ্নের উদয় হইল — তবে আমার কি হইয়াছিল? কে যেন তৎক্ষণাৎ অন্তরের অতল গভীর হইতে বলিয়া উঠিল — "মা গঙ্গার অবতরণ হয়েছে তোমার মধ্যে।" এই প্রথম ধন্য হইলাম মহামানবের দিব্য পরশে।

শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়

মহামানবের দিব্যাশীষ মাথায় নিয়া প্রায় অনেকগুলি বছর কাটিয়া গেল। ইহারই মধ্যে কয়েকবার তাঁহার পবিত্র স্পর্শানুভূতি লাভ করিয়াছি তাঁহারই কর্মের ধারায় কর্মরত অবস্থায় অবস্থান করাকালীন। তারই মধ্যে একদিন দিব্য স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম আমি বাকসাড়ায় শ্রীশ্রীসরোজবাবার (বাবাজী মহাশয়) বাড়ী গিয়াছি। তিনি তাঁহার ঘরে শয্যায় শায়িত রহিয়াছেন। কক্ষের দরজাটি কাঁচের এবং বন্ধ রহিয়াছে। বাবাজী মহাশয়ের শয্যা হইতে উঠিয়া দরজা খোলারও শক্তি নাই কারণ তাঁহাকে অসুস্থ বলিয়াই মনে হইল। তিনি আমায় কক্ষের দরজার সামনে দণ্ডায়মান রহিয়াছি দেখিয়া ঘরের ভিতর হইতেই বলিলেন, "আমি একরকম আছি। তোমার সঙ্গে সব সময় রয়েছি, থাকবো। এখন এসো।" আমি তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়া তাঁহার গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। তাঁহার গৃহের মূল দরজা দিয়া যখন বাহির হইয়া আসিতেছি তখন দেখিলাম, দরজার উপরে একটি ফটো মত বড় আয়না এবং তার মধ্যে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বসিয়া রহিয়াছেন। আমি যখন দরজা খুলিয়া সেই ফটোর তলা দিয়া বাহির হইয়া আসিতে যাইব তখন হঠাৎ ফটোর ভিতর হইতে লাহিড়ী মহাশয়ের দুটি রাঙা কোমল চরণ নীচের দিকে নামিয়া আসিল এবং আমার বক্ষস্থলে আসিয়া অবস্থান করিল। সেই মুহূর্তে আমি ওনার পদযুগলকে আঁকড়াইয়া ধরিলাম এবং জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের উপরিভাগে আমার মাথা রাখিলাম। এক অব্যক্ত ব্রহ্মচেতনার কম্পন আমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল, আর তখনই আমার দিব্য দর্শনও ভঙ্গ হইয়া গেল। আমি স্থূলচেতনায় ফিরিয়া আসিলাম। আবার ধন্য হইলাম মহামানবের দিব্য স্পর্শে। ইহার কয়েকমাস পরেই বাবাজী

মহাশয় স্বেচ্ছায় তাঁহার ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

এই মহামানব শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের চিন্ময় পবিত্র স্পর্শেই অন্তঃস্থিত প্রজ্ঞার আলোকে একদিন জ্ঞাত হই তাঁহার প্রকৃত আদি-সত্তার পরিচয়। তিনি ছিলেন ''ব্রহ্মর্ষি নারদ''। সত্যযুগে পুরাণ পরিচয়ে তাঁহাকে 'সত্যসুকৃত' আখ্যা প্রদান করেন সমগ্র দেবতা ও মহামানবের মহামণ্ডল।

মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মার অযোনি-সম্ভবা সৃষ্টির ব্রহ্মতেজোদীপ্ত বৈষ্ণবোত্তম পুত্রদিগের মধ্যে ''নারদ'' অন্যতম। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে ব্রহ্মার কণ্ঠ হতে নারদ জাত হন। — ''কণ্ঠদেশাচ্চ নারদঃ।'' ব্রহ্মার কণ্ঠকে 'নরদ' বলে; আর 'নর্দ' অর্থে সদ্‌ঘোষ বা শব্দ করা বোঝায়; অর্থাৎ, কণ্ঠ হইতে উদ্‌ঘোষিত নাদধ্বনি বা 'নরদ' হইতে জাত বলিয়া ব্রহ্মা ইহার নাম 'নারদ' রাখিলেন। বরাহ পুরাণে আছে — ব্রহ্মা প্রথমে রুদ্রাদি তপোধনগণ, পরে সনকাদি চতুঃসন, তারপরে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই দশজনকে সৃষ্টি করেন। তিনি সনক প্রভৃতিকে নিবৃত্তি ধর্মে, মরীচি প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি ধর্মে ও নারদকে মুক্তি পথে নিয়োগ করিয়াছিলেন। নারদের জন্মান্তরের প্রবাহে পাওয়া যায় যে কোনও জন্মে তিনি অবন্তীপুরে কোনও এক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া 'সারস্বত' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। সারস্বত সরোবরে (পুষ্করে) তপস্যা করিয়া তিনি ভগবান নারায়ণের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পরে সেই নারায়ণেই লয় প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ, 'নারায়ণ' অবস্থায় যোগযুক্ত হইয়া স্বারূপ্য লাভ করেন। সুতরাং নারদকে শ্রীহরির একটি রূপ বলা যায়। নারদ পিতৃলোককে 'নার' অর্থাৎ পানীয় দান করিয়া ''নারদ'' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। নারদ ''পঞ্চরাত্র'' নামক বৈষ্ণবীয় তন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত মতে নারদ বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বলিয়া পরিগণ্য হইয়াছেন। এইরূপে বিভিন্ন পুরাণ-মহাপুরাণে বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নারদ ঋষির জন্মজন্মান্তর বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন। তাই নারদকে পুরাণ-পুরুষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঋক্‌বেদেও পাওয়া যায় যে কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি নারদ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মর্ষি নারদের মহিমার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। বৈষ্ণব সাধক শিরোমণি শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর 'নারদ'-এর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিয়াছেন — ''শ্যাম'' বলে, সৃষ্টির সবই সুন্দর কোনটাই অসুন্দর নয়; সব বাণীই সেই শ্যামসুন্দরের বীণার ঝঙ্কার মাত্র। একই বাণী আধার ভেদে রূপ বদলায় মাত্র, নারদের একতারার হরিনাম শুনে আমার মনে নানান ভাবের রোদন আসে মাত্র; কারণ 'নারদ' মানেই বোধ হয় নানা রথ, নানান দ্বার রোধ করে, নানা রোদনের মাঝে এবং শোধনের সাজে পার করে সেই শ্যামের দুয়ারে বাঁশীর সুরে সুর মিশিয়ে সেই বংশীধারীর শিয়রে এনে দেয়, তখন সর্ব অঙ্গ শিহরি ওঠে, বাঁশীর সুর তখন যেন বলে দেয় 'ও শ্রীহরিই বটে', ওরই তটে এবং ওরই ঘটে তোমারই নাম রটে। নারদের প্রেমভক্তিভাব ও মুক্তিগামী কর্ম নরের সঙ্গে নারায়ণের সম্মিলন করার রীতিনীতিকে সিদ্ধান্ত ঠাকুর তাঁহার উপলব্ধির পর্য্যায়ে এইরকমই প্রগাঢ় অনুভূতি-ব্যঞ্জকভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। নারদ দেবলোকে দেবতাদিগের নিকট অনায়াসে যথাতথা পরিভ্রমণ করেন বলিয়া 'দেবর্ষি' নামে বিখ্যাত হন। অন্যদিকে যে কোন দেব বা দেবীর লীলা অথবা ভগবৎলীলার সূত্রধর এবং অবতারণার সূচক রূপে নারদের ভূমিকা চির প্রসিদ্ধ। যেমন নারদের নিকট রাম-চরিত্র শ্রবণ করিয়াই মহর্ষি বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। রামায়ণে আছে যে রাম-অবতারের কালে নারদ শ্রীরামের বনগমনকালে বশিষ্ঠের পাশে উপস্থিত ছিলেন। তুলসীদাসের রামচরিতমানসে আছে যে সীতাদেবী রামচন্দ্রকে পতিরূপে লব্ধ হইবার জন্য যখন দেবী ভবানীর নিকট পূজা প্রর্থনা করিলেন তখন দেবী ভবানী আবির্ভূত হইয়া সীতাকে বর প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন — ''সুনু সিয় সত্য অসীস হমারী, পূরিহি মন কামনা তুম্‌হারী। নারদ বচন সদা সুচি সাচা, সো বরু মিলি হি জাহিঁ মনুরাচা।।'' এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে 'নারদের বচন সদা শুচি ও সত্য'। তৎপরে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতার ধারণ করিলে পর দেখা যায় যে ব্রজমণ্ডলে নারদ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাকে শৈশবাবস্থায় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই ব্রজপুরের রাজগৃহ হইতে সকল ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে তিনি বিষ্ণুজ্ঞানে পূজিত হইয়াছিলেন। এইসব ক্ষেত্রেই ব্রহ্মর্ষি নারদের ঋষিরূপের অবতারত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবর্ষি নারদ

— হরি ওম তৎ সৎ —